#আমি পদ্মজা শেষ পর্ব (প্রথম অংশ)

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। প্রেমা ঘেমে একাকার। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে চৌচির! ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে নদীর পানি দিয়ে গলা ভেজাতে পারে। কিন্তু তার ইচ্ছে করছে না। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সাত মাস পূর্বেই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ভগ্নহৃদয় নিয়েই দিব্যি বেঁচে আছে! মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন সে বেঁচে আছে? তুষার তার হাতের সিগারেটটি নদীতে ফেললো। তারপর সামনে তাকালো। কালো বোরকা পরে বসে আছে প্রেমা। তার মাথার উপর বাঁশের ছাউনি। সে চোখ ছোট ছোট করে উদাসীন হয়ে তাকিয়ে আছে দূরে,বহুদূরে। তুষার চার মাস ধরে প্রেমাকে দেখছে। মেয়েটা সবসময় উদাসীন থাকে।

তুষার তার কপালের ঘাম মুছলো। গরম ভালোই পড়েছে। সে তার ব্যাগপ্যাক থেকে পানির বোতল বের করে গলা ভেজালো। তারপর প্রেমাকে ডাকলো,' এই মেয়ে,পানি খাও। গরম পড়েছে খুব।'

প্রেমা তাকালো না। তুষার তার এক ভ্রু উঁচিয়ে ডাকলো,' এই যে খুকী? '

প্রেমা ঘাড় ঘুরিয়ে ছোঁ মেরে বোতল নিল। তারপর আবার আগের মতো ঘুরে বসলো। প্রেমার ব্যবহারে তুষার বেকুব বনে যায়। তার মাথা চড়ে যায়। এইটুকু মেয়ে বেয়াদবি করলো কীভাবে? তুষার দূরে গিয়ে বসলো। কিন্তু তার রাগ বেশিক্ষণ রইলো না। দোষটা তো তারই! বয়সের পার্থক্যটা বেশি হওয়াতে প্রেমাকে তার বউ মনে হয় না। তাই গত চার মাসের দাম্পত্য জীবনে একবারও সে প্রেমার হাত ধরেনি। কখনো ভাবেওনি তার একটা বউ আছে! শুধু দুজন এক বাড়িতে থেকেছে,এই যা! এই যুগে

একরকম চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রী অহরহ দেখা যায়। তবুও কেন যেন তুষার প্রেমাকে ছোট স্কুলপড়ুয়া একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না! সে প্রেমার সাথে সবসময় দূরত্ব রেখেছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মেয়েটাকে সময় দেয়নি,এতোবার কাঁদতে দেখেও আদর করে কখনো কান্না থামায়নি! সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। তুষার যে রসকষহীন কাঠখোট্টা একটা মানুষ প্রেমা বুঝে নিয়েছে! তুষারও বুঝতে পেরেছে। তাকে বুঝিয়েছে তার মা। গত শুক্রবার জুম্মার পর তুষারের মা আয়তুন বিবি তুষারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। বুঝান, বউকে বউয়ের মতো দেখতে। বিয়ে যখন হয়েছে প্রেমাই তুষারের জীবনের নিখুঁত স্ত্রী। প্রেমা নিঃসঙ্গতায় কামড়ে খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। এক বোন কবরে অন্য বোন জেলে। যে স্বামী হয়েছে সেও দূরত্ব

বজায় রেখে চলে। এভাবে মেয়েটা কীভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে? মায়ের কথা শোনার পর তুষার কাজকর্ম রেখে অনেক ভেবেছে। উপলব্ধি করলো,পদ্মজার মুখে প্রেমার যে বর্ণনা সে শুনেছিল,যে প্রাণোচ্ছল, লজ্জাবতী মেয়েটার কথা সে শুনেছিল সে মেয়েটা আর আগের মতো নেই! তুষারের বিবেক জাগ্রত হয়। সিদ্ধান্ত নেয় প্রেমাকে সময় দিবে। সম্পর্কটাকে সুযোগ দিবে,সহজ করবে! তাৎক্ষণিক সে প্রেমাকে জানালো,তারা অলন্দপুরে ঘুরতে যাবে। তুষারের সিদ্ধান্ত শুনে প্রেমা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। গত দুইদিন তুষার ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছে। তাও সব কথা পড়া নিয়ে! এতো ছোট মেয়ের সাথে কী বন্ধুত্ব হয়! তুষার কথা বলে সম্পর্ক সহজ করতে গিয়ে আরো কঠিন করে তুলছে। সে কিছুতেই প্রেমার সাথে সহজ হতে পারছে না।

তারপর আজই দুজন গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হলো। পথে কেউ কোনো কথা বলেনি। অলন্দপুরে চলে এসেছে তারা। নৌকা ধীরগতিতে আটপাড়ার দিকে এগোচ্ছে। তুষার আড়চোখে প্রেমাকে দেখলো। প্রেমা ঝিম ধরে বসে আছে। তুষার খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে ডাকলো,' প্রেমা?'

প্রেমা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সে অবাক হয়েছে। স্বামী নামক কঠিন পাথরটি তাকে সবসময় খুকী বলে অথবা এই মেয়ে ডাকে! হুট করে প্রেমা ডাকটা শুনে অবাক হয়েছে আবার ভালোও লাগলো! তুষার গাম্ভীর্যতা ভেঙে প্রেমার দিকে এগিয়ে আসে। প্রেমার সামনে এসে বসলো। মাঝি বাউল গান গাইছে। গাইতে গাইতে বৈঠা বাইছে। তুষারকে এরকম মুখোমুখি বসতে দেখে প্রেমা উৎসুক হয়ে তাকায়।

তুষার বসেছে তো ঠিকই। কিন্তু কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না৷ আরো দুই-তিনবার খ্যাঁক করে কাশলো। তারপর বললো,' আমাদের সম্পর্কটা আসলে কী?'
এটা কেমন প্রশ্ন! প্রেমা ভ্রুকুটি করলো। তুষার নিজের প্রশ্নে নিজে হতভম্ব হয়ে যায়! হয় সে কঠিন,কঠিন কথা বলে। নয়তো কী বলে নিজেও বুঝে না। প্রেমাও বুঝে না। তুষার দুই দিনের চেষ্টায় বুঝে গিয়েছে মেয়ে মানুষ পটানোর চেয়ে আসামী ধরা সোজা! প্রেমার সাথে তার জমছেই না! আসলে কি পটাতে পারছে না? নাকি কীভাবে পটাতে হয় সেটাই তুষার জানে না? প্রেমা চোখ ফিরিয়ে নিল। তুষারের হাবভাব সে বুঝে না। বুঝার ইচ্ছেও নেই। মেট্রিক পরীক্ষাটা দেয়া হয়নি। আরো এক বছর পড়তে হবে! জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে। তার পাশে আপন বলতে কেউ নেই। প্রেমার বুক চিঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে

আসে। তুষার সেই দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। সে প্রেমার দিকে তাকালো। এইটুকু মেয়ের দীর্ঘশ্বাস এতো ভারী! তুষার নরম কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলো,' তুমি কি আমার উপর বিরক্ত?' তুষার নরম কণ্ঠে কথা বলার চেষ্টা করলেও, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যতা থেকে যায়। প্রশ্ন করে দুই ভ্রু কুঁচকে প্রেমার দিকে তাকায়। তার চাহনি দেখে মনে হচ্ছে,প্রেমা চোর! চুরি করে ধরা পড়েছে। আর তারই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রেমা জবাব দিল না। তুষারের ভ্রু দুটি আরো বেঁকে গেল। সে কাঠ কাঠ স্বরে বললো,'প্রশ্ন করেছি তো? উত্তর কোথায়?'
প্রেমা অন্যদিকে চোখ রেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'না। বিরক্ত না।'
'তাহলে আমার সাথে কথা বলো না কেন?'
প্রেমা নির্বিকার চোখে তাকালো। বললো,' আপনিও তো বলেন না।'

তুষার থতমত খেয়ে যায়। প্রথম প্রথম প্রেমা তুষারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে৷ তখন তুষারই হু,হ্যাঁ এর বেশি কিছু বলেনি। তাই কখনো দীর্ঘ আলাপ হয়নি। প্রেমার কথায় তুষার বিব্রতবোধ করলেও নিজেকে গুটিয়ে নিল না। সে কখনো হারেনি। সবসময় জয়ী হয়েছে। এবারের চ্যালেঞ্জটা মেয়েলি ব্যাপার! যাই হোক,সে হারবে না। হ্যাঁ...কিছুতেই হারবে না। তুষার মাছি তাড়ানো মতো হাত নাড়িয়ে বললো,' পিছনের কথা বাদ। এখন থেকে দুজনই কথা বলবো। ঠিক আছে?'

প্রেমা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। তুষার বললো,' বেশি গরম লাগছে?'

'লাগছে।'

তুষারের দূরে চোখ রেখে বললো,'আর কিছুক্ষণ। এসেই পড়েছি।'

আচমকা কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। দখিনা বাতাস ধেয়ে আসে। দস্যি বাতাসে প্রেমার ওড়নার একাংশ ছাউনির বাইরে চলে যায়। তুষার ধরলো। প্রেমা তার অবাধ্য ওড়নাকে সুন্দর করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল। তিন-চারদিন ধরে হুটহাট বাতাস বইছে। সেই সাথে ভ্যাপসা গরম তো রয়েছেই। তুষার চোখ ছোট ছোট করে চারপাশ দেখছে। নদীর দুই পাড়ে দুই গ্রাম। বামে হিন্দু পাড়া ডানে আটপাড়া। আটপাড়ার সব মানুষ মুসলমান। তুষার বললো,' হিন্দু পাড়ায় কখনো গিয়েছো?'

'হু,অনেকবার।'

তুষার প্রেমার মুখের দিকে তাকালো। বললো,'আমাদের বিয়েটা কী করে হলো জানো?'

'জানি।'

,'কী জানো?'

প্রেমা নির্বিকার স্বরে বললো,'হানি খালামনির কাছে আপনার আম্মা প্রস্তাব নিয়ে যান। তারপর কিছু বুঝে উঠার আগে পরদিনই আমার বিয়ে হয়ে যায়।'
তুষার গুরুতর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো,'অচেনা একজনকে এক কথায় বিয়ে করে নিলে কেন? তোমার অনুমতি নেয়া হয়নি?'
তুষার এসব কেন জিজ্ঞাসা করছে প্রেমা জানে না। জানতে ইচ্ছে হলেও সে প্রশ্ন করবে না।
প্রেমা উদাস গলায় বললো,' তখন আমার অভিভাবক আমার নানু আর খালামনি ছিল। আমার ভাবার বা বলার কিছু ছিল না। খালামনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।

'তুমি এই বিয়েতে সুখী হতে পারোনি তাই না?'

তুষারের সহজ/সরল প্রশ্ন! প্রেমা তুষারের চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। মানুষটা

হঠাৎ করে তার সুখ নিয়ে ভাবছে কেন? সে চোখ নামিয়ে ফেললো। কিছু বললো না। তুষার মিনিট দুয়েক সময় পার করে বললো,' আমাদের বিয়ে হউক তোমার বড় আপা চেয়েছিলেন।'
প্রেমা চকিতে তাকালো। তার চোখ দুটি হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে উঠে। তুষার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে,প্রেমার মুখটা কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। প্রেমা বললো,'আপা চেয়েছিল?' তুষার বললো,' তোমার আপা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলেও তিনি তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তখন আমার আম্মা আমার বিয়ে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বার বার টেলিফোন করতেন। বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতেন। আমি বিয়েতে আগ্রহী ছিলাম না। আমার বেড়ে উঠা অন্য দশজনের মতো ছিল না। বাবা ছাড়া শহরে বেড়ে উঠা ছেলেমেয়েগুলো জানে জীবন কতোটা নিষ্ঠুর

হতে পারে! তোমার আপা কম কথা বলতেন। কথা বলতে বলতে হুট করে থেমে যেতেন। তার মাঝে আম্মাও কল করতেন অনবরত। তাই একবার আম্মার সাথে চেঁচামেচি করেছিলাম। কিছু কথা তোমার আপার কানে যায়। সেদিনই রাত্রিবেলা হাওলাদার বাড়ি সম্পর্কে বলতে বলতে তোমার আপা থেমে যান। বাকি কথা কিছুতেই বলছিলেন না। যখন জোর করছিলাম বলার জন্য। আমাকে অনুরোধ করেন, আম্মাকে নিয়ে তোমাকে একবার যেন দেখতে যাই। আর আম্মার পছন্দ হলে যেন বিয়ে করি। ততক্ষণে তোমার সম্পর্কে অনেককিছুই শুনেছি। আমার বিয়ে করাও জরুরি নয়তো আম্মা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিবেন। অন্যদিকে তোমার আপা নিজ ইচ্ছায় কিছু না বললে কিছু জানাও সম্ভব নয়। তাই কথা দেই,তোমাকে দেখতে যাব। তোমার আপা হাসিমুখে বাকিটুকু বলেন। তিনি যেন

নিশ্চিত ছিলেন, আম্মা তোমাকে দেখলে পছন্দ করবে। ঠিক তাই হলো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তুমি আর তোমার পরিবার হানি খালামনির বাসায় আছো। আম্মাকেও জানাই,একটা মেয়ে আছে দেখে আসো পছন্দ হয় নাকি। আম্মা তো খুব খুশি। তোমাকে দেখার পর রাত্রে ঘুমাননি। সারারাত তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। বাকিটুকু তো তুমি জানো।'

'আমাকে বিয়ে করাটা অনুগ্রহ ছিল?' প্রেমার কণ্ঠটা কেমন যেন শোনায়।

তুষার কৈফিয়ত দেয়ার মতো বললো,' মোটেও না। আম্মার পছন্দ না হলে বিয়েটা হতো না। তোমার আপাও কিন্তু আমার উপর চাপিয়ে দেননি। বলেছেন,একবার যেন দেখি। পছন্দ হওয়ার পর বিয়ে। আর আমার আম্মার তোমাকে পছন্দ হয়েছে। বরং তোমার সাথে আমাকে মানায় না।'

‘কেন মানায় না?’ প্রেমা নিজের অজান্তে প্রশ্ন করলো।
তুষার বললো,’ আমার বয়স বেশি।’
প্রেমা আর কথা বাড়ালো না। তার ভালো লাগছে! হুট করেই ভীষণ ভালো লাগছে। এমনকি কাঠখোট্টা তুষারকেও এখন তার ভালো লাগছে। সে মৃদু হাসলো। তুষার প্রেমার হাসি খেয়াল করে বললো,’ হাসছো যে?’
প্রেমা ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললো,’ আপনার গোঁফ জমিদারদের মতো বড় বড়।’
প্রেমার কথা শুনে তুষারও হাসলো। পদ্মজা নামটাতে জাদু আছে। তার কথা উঠতেই প্রেমা হেসেছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তুষার বললো,’ তোমার নানাবাড়িতে এখন কে কে আছে?’
‘নানু আর হিমেল মামা।’
‘নানুর কিডনিতে কী না হয়েছিল? অপারেশন হয়েছে শুনেছি। শহরেই মেয়ের কাছে

থাকতেন। গ্রামে আসতে গেলেন কেন?'
প্রেমা অবাক হওয়ার ভান ধরে বললো,"আমি কী এখানে থাকি যে জানব?'
প্রেমা থামলো। তারপর আবার বললো,'গত বছর আপা যখন আসছিল গ্রামে। তখন নানু আর মামা খালামনির কাছে ছিল। নানুর অপারেশন তখন হয়েছে। অনেকদিন কেটে গেছে। এখন নানু সুস্থ।গ্রামে সমস্যা হবে না।'
'তোমার নানাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। দেখতে পারিনি।' আক্ষেপের স্বরে বললো তুষার।
প্রেমা বললো,' নানা তো দুই বছর আগেই চলে গিয়েছেন। দেখবেন কী করে!'
তুষার ছাউনির বাইরে আঙুলে ইশারা করে বললো,'তোমাদের বাড়ির ঘাট না?'
প্রেমা বাইরে তাকালো। বললো,' হু,এতো জলদি চলে এসেছি!'
তুষার কাপড়ের ব্যাগ হাতে নিয়ে বললো,'কথা বলতে বলতে সময় কেটে গেছে।'

নৌকা মোড়ল বাড়ির ঘাটে এসে থামলো। তুষার মাঝিকে টাকা দিয়ে প্রেমাকে হাতে ধরে নামায়। প্রেমার হাত ধরার সময় তুষারের মনে হলো, এতো কোমল হাত সে কখনো ধরেনি! তাৎক্ষণিক তার বুকের ভেতর কী যেন হয়!

প্রেমা উঠানে পা রাখতেই বাসন্তীর সাথে দেখা হয়। বাসন্তী প্রেমাকে দেখে চমকে যান। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন। প্রেমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। বাসন্তীর কান্না শুনে রুম্পা আর প্রান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রুম্পা বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রান্ত বাইরে ছুটে আসে। বাসন্তী কাঁদতে কাঁদতে বললেন,'ও মা! মা আমার!'
প্রেমার আকস্মিক আগমন তিনি হজম করতে পারছেন না। মোড়ল বাড়ি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির মাঝে প্রেমা যেন জল হয়ে এসেছে! প্রেমা বাসন্তীর পিঠে হাত বুলিয়ে

বললো,'শান্ত হও বড় আম্মা। শান্ত হও।'
বাসন্তী প্রেমার কপালে,গালে চুমু দিলেন।
তুষার পাশ থেকে সালাম দিল৷ বাসন্তী চোখের জল মুছে তুষারকে বললেন,'ভালো আছো আব্বা?'
'জি আম্মা। আপনি তো অনেক শুকিয়ে গেছেন।'
'মেয়েগুলো কাছে নাই। তারা ভালো নাই। আমি কেমনে ভালো থাকি বাপ?'

প্রেমা প্রান্তর দিকে তাকাতেই প্রান্ত প্রেমার মাথায় থাপ্পড় দিল। বললো,' এতদিন পর আসলি!'
প্রেমা প্রান্তর চুল টেনে ধরে বললো,'একদম মাথায় থাপ্পড় দিবি না। আমার মাথা ব্যথা করে।'
প্রান্ত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তুষারকে দেখে থেমে যায়। তুষার হাসতে কার্পন্য

করলো না। সে প্রান্তর সাথে হ্যান্ডশেক করে বললো,' দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

কুশল-বিনিময় শেষে বাসন্তী তুষার আর প্রেমাকে নিয়ে বারান্দায় পা রাখলেন। দেখা হয় রুম্পার সাথে। রুম্পার পেট উঁচু হয়েছে। তার গর্ভাবস্থার সাত মাস চলছে। সে এই বাড়িতেই থাকে। হাওলাদার বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। সাত মাসে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আমিনা আলোকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। বৃদ্ধা নূরজাহান মারা গিয়েছেন। বিদেশ থেকে লাবণ্য ও জাফর তাদের স্বামী-স্ত্রী নিয়ে দেশে এসেছিল। দুই সপ্তাহ থেকে আবার ফিরে গিয়েছে। গ্রামবাসী এখন হাওলাদার বাড়িতে যেতে ভয় পায়। সেখানে নাকি আত্মারা ঘুরঘুর করে! প্রেমা রুম্পাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। কুশল-বিনিময় শেষ করে রুম্পা তুষারকে প্রশ্ন

করলো,' উনি ভালা আছে? জেলে খাওনদাওন দেয়? মারে কেউ?'
রুম্পার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। তুষার রুম্পাকে আশ্বস্ত করে বললো,'আলমগীর সাহেব ভালো আছেন,সুস্থ আছেন। খাবার দেয়া হয়। কেউ মারধোর করে না। আপনি চিন্তা করবেন না।'
রুম্পা হাসলো। আলমগীর সুস্থ আছে এই খবরটুকুই রুম্পার বেঁচে থাকার শক্তি!

সাত মাস পূর্বে, রবিবার দুপুরে মুমিন নামে একজন ব্যাক্তি মজিদের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখে ফরিনার কবরের পাশে এক মেয়ে শুয়ে আছে। তার পরনের সাদা শাড়ি রক্তে রাঙা। আর কবরের উপর একটা মাথা! মজিদ হাওলাদার মুমিনকে নতুন দারোয়ান হিসেবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। মুমিন এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যায়। জান নিয়ে দৌড়ে পালায়। তারপর

ঘন্টাখানেকের মধ্যে হাওলাদার বাড়ির গণহত্যার ঘটনা পুরো অলন্দপুরে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক জড়ো হয়। পদ্মজা এতো মানুষকে দেখেও নীরব থাকে। তার রূপ হয় রূপকথার অতৃপ্ত অশরীরীর মতো। কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলো,ডাকলো,কুহকিনী, ডাইনি,রাক্ষসী ! থানা থেকে পুলিশ আসে। পদ্মজাকে শহরে নিয়ে যায়। নৃশংস এই খুনের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। টেলিভিশন, রেডিও সব জায়গায় এক কথা,

"অলন্দপুরের ছোট গ্রাম আটপাড়ার হাওলাদার বাড়ির বধূ উম্মে পদ্মজা চলচ্চিত্র অভিনেতা লিখন শাহর সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে খুন করেছে স্বামী,শ্বশুর,ভাসুর ও চাচা শ্বশুরকে। সাথে আরেকটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। তাকে খুন করার কারণ এখনও শনাক্ত করা যায়নি।'

এক দিনের ব্যবধানে পুরো দেশে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নৃশংস খুনের বর্ণনা শুনে কেউ কেউ রাতে ঘুমাতে পারেনি। গ্রামবাসী তাদের প্রিয় ও মহান মাতব্বরের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে। তারা সমস্বরে চিৎকার করে জানায়,তারা পদ্মজার ফাঁসি চায়। মুহূর্তে পুরো দেশের কাছে কলঙ্কিত হয়ে যায় পদ্মজা। আলমগীর গ্রামে এসে শুনে পুলিশ পদ্মজাকে ধরে নিয়ে গেছে! খুন হয়েছে বাড়ির প্রতিটি পুরুষ। সব শুনে ঘাবড়ে যায় আলমগীর। ফিরে যায় রুম্পার কাছে।
মগা গ্রামে প্রবেশ করতেই পুলিশ তাকে পূর্ণার খুনের দায়ে আটক করে। আলমগীর ঘরে ফিরে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। রুম্পা আলমগীর কে অনেক প্রশ্ন করলো,আলমগীর জবাব দিল না। আমিরের দেয়া নীল খামটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। এই খামে একটা চিঠি আর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ

দলিল রয়েছে। চিঠিতে লেখা এক পরিকল্পনা। আর ঘটেছে অন্য ঘটনা! সবাই যেভাবে পদ্মজার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে,ফাঁসি নিশ্চিত! সে চাইলে পদ্মজার ফাঁসি আটকাতে পারে। তার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের জীবন ও সংসার ত্যাগ করতে হবে। এতো সাধনার পর পাওয়া নতুন জীবন ভালো করে উপভোগ করার পূর্বে কিছুতেই সে বন্দী হতে চায় না! আলমগীর খাম থেকে চিঠিটি বের করে আরো একবার পড়লো;-

প্রিয় বড় ভাই,
বড় বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছি। এখানে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। পদ্মজা জেনে গিয়েছে সব সত্য। তোমার চিঠি পাওয়ার পূর্বেই সব জেনেছে। আমি বিস্তারিত কিছু লেখব না। তুমি পরে পদ্মজার কাছে জেনে নিও। আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। তার

আগে আমি চারজনকে হত্যা করতে চাই। তার মাঝে তিন জন পদ্মজার নামে কুৎসা রটিয়েছে। আমি তখন গ্রামে ছিলাম না। ঢাকা গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে তারা সুন্দর চাঁদে দাগ ছিটিয়েছে। রবিবারের সকাল আমার দেখা হবে না। আমার বেঁচে থাকা পদ্মজার জন্য হুমকি! সেই সাথে আমার জন্য ভীষণ কষ্টের। আমি তোমাকে কিছু দলিল দিয়েছি। যা প্রমাণ করে আমি একজন নারী পাচারকারী। সেই সাথে এটাও প্রমাণ করে,আমার সাথে কারা কারা ছিল। একটু খুঁজে দেখো দলিলগুলোর মাঝে আরেকটি চিরকুট আছে। সেখানে আমি স্পষ্ট করে আমার সাথে কাজ করা সবার নাম লিখে দিয়েছি। যাদের বর্তমান ঠিকানা জানা আছে সেই ঠিকানাও লিখে দিয়েছি। আমি প্রমাণ সহ স্বীকার করেছি,আমার সব অপরাধ। তোমার নাম সেখানে কোথাও নেই। কোথায় মেয়ে পাচার হয়? কীভাবে হয়? কারা

এই কাজের সাথে যুক্ত? আমার জানা সব বিস্তারিত লেখা আছে। আমার দেয়া ঠিকানা অনুসারে খোঁজ চালালে উদ্ধার হবে,আড়াইশোরও বেশি মেয়ে! তুমি এই চিরকুট নিজের কাছে রেখে আমার স্বীকারোক্তি চিরকুটটি ও সকল দলিল প্রমাণ হিসেবে সকলের সামনে উন্মোচন করবে। রুম্পা ভাবিকে বাঁচিয়ে রাখার অবদান পুরোটাই আমার ছিল। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে হলেও তুমি পদ্মজাকে কলঙ্কমুক্ত করো ভাই। পদ্মজাকে নিজের সাথে নিয়ে যেও। দেখে রেখো। তোমার কাছে আমানত রেখে গেলাম।

ইতি,
আমির হাওলাদার

আলমগীর চিঠি মেঝেতে রেখে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে। সে মগার থেকে চিঠি পাওয়ার পর পরই আমিরকে বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে।

আমিরকে সে ভীষণ ভালোবাসে। আমিরের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত আলমগীরকে বসে থাকতে দেয়নি। কিন্তু গ্রামে পৌঁছে শুনলো সব শেষ! পদ্মজা খুন করেছে সবাইকে। আর এখন পদ্মজা মিথ্যা অপবাদে জেলে বাস করছে। এই মুহূর্তে সে যদি এই প্রমাণসমূহ নিয়ে সে পুলিশের কাছে যায়। পুলিশ তাকেও আটক করবে। সে পুলিশকে মিথ্যে বলতে পারবে না। সেই সাহস হবে না। সব সত্য জানার পর তার ফাঁসিও হতে পারে। সে নিজেকে উৎসর্গ করার সাহস পায় না।

পদ্মজার মামলার তর্কবিতর্কে যখন পঁচিশ দিন পার হয় তখন রুম্পা নিজ ইচ্ছায় আলমগীরকে অনুরোধ করলো,আলমগীর যেন পদ্মজাকে বাঁচায়। মিথ্যা অপবাদে পদ্মজার ফাঁসি হতে দেখে সে সুখের সংসার করতে পারবে না। পদ্মজা পরকীয়ায় লিপ্ত

হয়ে কাউকে খুন করেনি,এই টুকু সত্য যেন আলমগীর সবাইকে জানায়। আলমগীর রাতেই রুম্পাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পদ্মজাও তখন সব স্বীকার করেছে। সব প্রমাণ পাওয়ার পর দেশের পরিবেশ পাল্টে যায়। জনগণের মাথায় পড়ে হাত। আমিরের দেয়া তথ্যানুসারে ধরা পড়ে কয়েকটি চক্রের নেতা! তদন্ত চালিয়ে জানা যায়, স্বয়ং বাণিজ্য মন্ত্রী এই চক্রের সাথে জড়িত৷ উদ্ধার হয় তিনশোরও বেশি অসহায় মেয়ে। কেউ কেউ পলাতক। এই খবর দেশের বাইরেও বেরিয়ে পড়ে। কুয়েত,সৌদি সহ আরো কয়েকটি দেশে তদন্ত শুরু হয়। তারা চিরুনি অভিযান চালিয়ে আমিরের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে মেয়ে সংগ্রহকারীদের খুঁজে চলে। দুজন ধরা পড়ে। বাকিরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উদ্ধারকৃত মেয়েগুলি নতুন জীবন পেয়ে

আনন্দে আত্মহারা। আমিরের চিঠিতে নতুন গোপন তথ্য ছিল, অন্দরমহলের পিছনে বড় নারিকেল গাছটির নিচে একটি বিশাল গর্ত আছে যেখানে ছুরি,রাম দা,চাপাতি,কুড়াল,চাবুক সহ অনেক অস্ত্র রয়েছে। তুষার অস্ত্রসমূহ উদ্ধার করে,সেই সাথে উদ্ধার হয় পদ্মজার জন্য রেখে যাওয়া আমিরের লাল খামটি! পদ্মজা তখন অস্বাভাবিক ছিল। সে নিজের মধ্যে ছিল না। তাকে হাসপাতালে রাখার আদেশ দেয় আদালত। দেড় মাসের চিকিৎসার পর পদ্মজার শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা সেড়ে উঠে। আদালত থেকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। আলমগীর রাজ স্বাক্ষী হওয়াতে ফাঁসির বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। শেষ নিঃশ্বাস অবধি সে কারাগারে কাটাবে। তারপর রুম্পা চলে আসে গ্রামে। গ্রামে আসার এক মাস পর জানতে

পারে সে গর্ভবতী। তার শূন্য জীবনে আশার আলো হয়ে আসে সন্তান আগমনের সংবাদ! দেশবাসীর মুখের কথা পাল্টে যায়। তারা পদ্মজার মুক্তি চেয়ে আজও আন্দোলন করে চলেছে!

পরদিন সকাল সাতটা। তুষার খাওয়াদাওয়া করে মাত্র উঠেছে। তখন দুই-তিনটে কুকুরের চিৎকার ভেসে আসে। তুষার দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকালো। সকালের মিষ্টি বাতাসে বিষণ্ন এক দৃশ্য চোখে পড়ে। অপরিচ্ছন্ন মৃদুল কুকুরগুলোর সাথে কী নিয়ে যেন তর্ক করছে! মাঝেমধ্যে মাটি ছুঁড়ে মারছে। তুষার
দ্রুতপায়ে মৃদুলের দিকে এগিয়ে যায়। তুষারের পিছন পিছন বাসন্তী ও প্রেমাও গেল। গতকাল রাতে তুষার মৃদুলকে দেখতে এসেছিল।তখন মৃদুল পূর্ণার কবরের পাশে ঘুমাচ্ছিল। জুলেখা

বানু ডাকতে নিষেধ করেন। তাই তুষার ডাকেনি।

গোঁফ-দাড়ির জন্য মৃদুলকে চেনা যাচ্ছে না। গায়ে মাটি লেগে আছে।
প্যান্টের এক পা হাঁটু অবধি ছেঁড়া। তুষারকে দেখে মৃদুল দুই কদম পিছিয়ে গেল। লাহাড়ি ঘর থেকে জুলেখা বানু বেরিয়ে আসেন। তিনি ভীষণ শুকিয়েছেন। চোখেমুখে আগের সৌন্দর্যটুকু নেই। একমাত্র ছেলেকে রেখে তিনি নিজের বাড়িতে ঘুমাতে পারেন না। মৃদুল মোড়ল বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ে না। সে তার সুস্থ জীবন পূর্ণার সাথে কবর দিয়েছে। মাস তিনেক আগে মৃদুলকে জোর করে বেঁধে শহরের ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে পাগলা গারদে রেখে আসা হয়। তিন-চার দিন পার হতেই খবর আসে,দারোয়ান ও দুজন নার্সকে আহত করে

মৃদুল পালিয়েছে। জুলেখা বানু এই খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে যান। মৃদুলের জ্ঞান সুস্থ নয়। সে কী করে গ্রামে ফিরবে? দীর্ঘ পনেরো দিন পর মৃদুলকে এক গ্রামে পাওয়া যায়। জুলেখা বানু কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়েন। মৃদুল পাগল থাকুক তাও চোখের সামনে থাকুক সেটাই তিনি চান। তাই মৃদুলকে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু মৃদুল পূর্ণাকে ছাড়া কিছুতেই খাবে না। তাই বাধ্য হয়ে মৃদুলকে আবার মোড়ল বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃদুল সর্বক্ষণ পূর্ণার কবরের পাশে বসে থাকে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। পূর্ণার কবরের চারপাশে গর্ত করে বাঁশ পুঁতেছে তারপর টিনের ছাদ দিয়েছে,যেন পূর্ণা বৃষ্টিতে না ভিজে। রাতে পূর্ণার জন্য কিনে আনা লাল বেনারসিটি আঁকড়ে ধরে ঘুমায়। জুলেখা বানু জোর করে দুইবেলা খাইয়ে দেন। মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতে যান।
নিজের বিলাসবহুল বাড়ি নিয়ে জুলেখা বানুর

অহংকার ছিল। আর আজ ছেলের জন্য তাকে অন্যের বাড়ির লাহাড়ি ঘরে থাকতে হচ্ছে। সন্তানের উপরে যে কিছু নেই! গ্রামের বাচ্চারা মৃদুলকে লাল পাগল ডাকে। লাল পাগল ডাকার কারণ,মৃদুল ফর্সা,সুন্দর! যদিও তার সৌন্দর্য টিকে নেই। গোলাপি ঠোঁট দুটি কালচে হয়েছে। তুষার মৃদুলকে আদুরে স্বরে ডাকলো,' মৃদুল।'

মৃদুল এক নজর তুষারকে দেখলো। তারপর দূরে সরে গেল। তুষার জুলেখা বানুকে প্রশ্ন করলো,'মৃদুল খেয়েছে?'

জুলেখা ভেজা কণ্ঠে বললেন,' না। খায় নাই। কাইল থাইকা খাইতাছে না।'

তুষার কপাল ইষৎ কুঁচকে মৃদুলের দিকে তাকালো। জুলেখাকে আবার প্রশ্ন করলো,'শুনেছিলাম ডাক্তারের কাছে নিয়েছিলেন। ওর অবস্থা কেমন? মাথা কতটুকু কাজ করে?'

জুলেখা বানুর চোখের কার্ণিশে জল জমে। তিনি বললেন,' বাচ্চারাও ওর থাইকা বেশি বুঝে। যত দিন যাইতাছে পাগলামি বাড়তাছে। আমি আর ওর বাপে ছাড়া যে যেইডা কয় ওইডাই বিশ্বাস করে।'

'চাচা কোথায়?'

'বাড়িত। বাড়িঘর জমিজমা দেহন লাগে না? আর কেলা দেখবো? কেউ আছে?' জুলেখার কণ্ঠে অসহায়ত্ব স্পষ্ট।

তুষার মৃদুলের পাশে গিয়ে বসলো। বললো,' আমাকে ভয় পাচ্ছো?'

মৃদুল আড়চোখে তুষারকে দেখলো। মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো,সে ভয় পাচ্ছে। হাওলাদার বাড়ির খুঁটিনাটি তদন্ত করতে তুষার যখন অলন্দপুরে এসেছিল তখন মৃদুলের সাথে তার দেখা হয়। তখন মৃদুলের এতো খারাপ অবস্থা ছিল না। তুষার বললো,'আজ রাজহাঁস জবাই করবো৷ তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

মৃদুল কিছু বললো না। তুষার বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললো,'আম্মা,রাজহাঁস আছে না?'
'আছে আব্বা।' বললেন বাসন্তী।
তারপর তুষার মৃদুলকে বললো,'রাজহাঁস আছে। অর্ধেক আমরা খাব আর অর্ধেক পূর্ণাকে দেব। পূর্ণা রাজহাঁস খেতে পছন্দ করতো। তাই না প্রেমা?'
কোনাকালেই পূর্ণা রাজহাঁস পছন্দ করতো না। তাও প্রেমা তুষারের সাথে তাল মিলালো। তুষার সাবধানে মৃদুলকে বললো,' তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো আর আমার সাথে খেতে না বসো আমি কিন্তু পূর্ণাকে কিছু দেব না। দেখিয়ে দেখিয়ে খাব। তখন পূর্ণা কষ্ট পাবে।'
মৃদুল পূর্ণার কবরে হাত বুলিয়ে দিল। সে চিন্তা করছে কী করবে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে রাজি হলো। সারাদিন তুষারের সাথে ভালো সময় কাটে। তুষার এমনভাবে কথা বলে,যেন পূর্ণা সত্যি বেঁচে আছে। মৃদুল তুষারের সঙ্গ

উপভোগ করে। এক ফাঁকে জুলেখাকে তুষার জানালো, মৃদুলকে ঢাকা নিয়ে গেলে ভালো হয়। আরেকটু চেষ্টা করে দেখা যেত। জুলেখা তুষারের দুই হাত ধরে অনুরোধ করেন, মৃদুলের সুস্থতার জন্য তিনি সবরকম খরচ করতে প্রস্তুত। শুধু মৃদুলকে যেন তুষার সামলায়। তুষার জুলেখাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর আটপাড়ায় ঘুরাঘুরি করে জানতে পারলো, মগা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ইয়াকুব আলীর বাড়িতে কাজ নিয়েছে। আর ইয়াকুব আলী অলন্দপুরের মাতব্বর হয়েছেন।

দিনের আলো কেটে রাত নামতেই মৃদুল পূর্ণার কবরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর তুষার রাতের খাবার খেয়ে ঘরে আসে। প্রেমা মশারি টানাচ্ছে। বাইরে বিরতিহীনভাবে ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। তাদের ডাকাডাকিতে তুষারের কানে তালা লেগে যাচ্ছে। সে ঝিঁঝিঁ পোকার

ডাক পছন্দ করে না। অন্যদিকে প্রেমার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভীষণ পছন্দ। সে মুগ্ধ হয়ে শুনে। তুষার দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে বিরক্তি নিয়ে বললো,'পোকাগুলো কি সারারাত ডাকাডাকি করবে?'

প্রেমা বললো,'মাঝরাত অবধি ডাকবে।'

তুষার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,'মাঝরাত অবধি জেগে থাকবো?'

'কানে তুলা দিয়ে রাখুন।'

'আছে তুলা?' বললো তুষার।

প্রেমা আলমারি খুলে তুলা বের করে দিল। তুষার প্রেমার কাণ্ডে বিস্মিত! সত্যি সত্যি তুলা দিয়ে দিল! এই মেয়ে নাকি বাকি দুই বোনের চেয়ে লজ্জাবতী আর ভীতু ছিল! অথচ,পদ্মজা আমিরকে লজ্জা পেত। পূর্ণা মৃদুলকে লজ্জা পেত। আর প্রেমা লজ্জা তো দূরের কথা তার চেয়ে এতো বড় মানুষটিকে পরোয়াও করে না।

নির্বিকার ভঙ্গিতে থাকে। সময় ও পরিস্থিতি মানুষকে কতোটা পাল্টে দেয়! তুষার তুলা হাতে বসে রইলো। প্রেমা খেয়াল করেও কিছু বললো না।

শোবার সময় প্রেমা প্রশ্ন করলো,'আপার কারাদণ্ডের সময় কি কমানো যায় না?'

'কমতে পারে। মনে হয় না এতদিন জেলে রাখবে। অনেক সময় যতদিন জেল হওয়ার কথা ততদিন হয় না।"

'এমনও হয়?'

'হয়। মেয়াদের আগে মুক্তি পেয়ে যায় অনেকে। তাছাড়া লিখন শাহ দৌড়াদৌড়ি করছেন,জনগণও চাইছে সাজা কমানো হউক। কমবে নিশ্চয়ই।'

'আপা কি জেল থেকে বের হয়ে লিখন ভাইয়াকে বিয়ে করতে রাজি হবে?'

'আমার যতটুকু ধারণা, রাজি হবে না। লিখন শাহ আশা নিয়ে বসে আছেন। পূরণ হওয়ার

সম্ভাবনা খুবই কম। পদ্মজা লিখন শাহকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন ।'
প্রেমা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো,'কী লেখা সেখানে?'
তুষার চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে বসলো। বললো,' আমি পড়িনি। পিন্টুকে দিয়ে পাঠিয়েছি।'
প্রেমা ছোট করে বললো,'ওহ।'
তারপর প্রশ্ন করলো,'গত কয়েকদিনের মধ্যে আপার সাথে দেখা হয়েছে?'
'হ্যাঁ,গতকাল বিকেলেই দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে দেখলেই গুটিয়ে যান। পর পুরুষের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। তাই না?'
প্রেমা হেসে মাথা ঝাঁকালো। আবার পদ্মজার কথা শুনে প্রেমা হেসেছে! তুষার প্রেমাকে ভালো করে খেয়াল করলো। পদ্মজার মুখের ছাপ প্রেমার মুখে আছে। প্রেমা সবসময় সোজা সিঁথি করে বেণি করে। শাড়ি পরে বলে

বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড় লাগে। এই যা...হুট করে প্রেমাকে বড় মনে হচ্ছে কেন? এতদিন তো শাড়ি পরাই দেখেছে। বড় তো লাগেনি! এ কোন কেরামতি! তুষার মুচকি হাসলো। প্রেমা তুষারকে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে বললো,' হাসছেন কেন?'
তুষার টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললো,' আমির হাওলাদার তিনটে বিয়ে করেছেন। আমি হলে চারটে বিয়ে করতাম। চার বিয়ে করা সুন্নত!'
প্রেমা বাঁকা চোখে তুষারের দিকে তাকালো। বললো,' করুন গিয়ে। তবে ভাইয়ার প্রথম দুটো বিয়ের কোনো মূল্য নেই। ভাইয়ার বউ একমাত্র আমার আপা।'
তুষার এক হাতে মাথার ভর দিয়ে প্রেমার দিকে ফিরে বললো,'কেন মূল্য নেই?'
'ইসলামে পালিয়ে বিয়ে করার মূল্য নেই। মেয়ের অভিভাবক লাগে। ভাইয়ার দুটো বউ

বাসায় কিছু না বলে বিয়ে করেছে। তাই হাশরের ময়দানে আমির ভাইয়ার বউ শুধু আমার আপা!' কথাটা প্রেমা ভাব নিয়ে বললো।

তুষার আবার হাসলো। সোজা হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো। মাঝে দূরত্ব রেখে প্রেমাও শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তুষার বললো,'প্রেমা? '

প্রেমা জেগেই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বললো,'সাত দিনের কথা তো আজ একদিনে বলে ফেলছেন!'

প্রেমার কণ্ঠে ঝাঁঝ। তার মনে তুষারের জন্য কতো রাগ জমে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে। কেন এতো রাগ? সে কি গত চার মাসে তুষারের সঙ্গ পাওয়ার আশা করে বার বার নিরাশ হয়েছে? সত্যি এমন কিছু হয়েছে? তুষার ভাবলো। অদ্ভুত বিষয় প্রেমার মুখের ঝাঁঝালো কথাগুলো তুষারের ভালো লাগছে।

সর্বনাশ! তবে কি সেও মরণ প্রেমে পড়তে যাচ্ছে! পরিণতি আমিরের মতো হবে নাকি মৃদুলের মতো? নাকি আরো ভয়ানক?
হঠাৎ নীরবতা ভেঙে তুষার বলে উঠলো, 'জানো প্রেমা,ভালোবাসার ব্যাখা ও রূপের বাহার পর্যবেক্ষণ করতে গেলে মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়।'
তুষারের গলার স্বরটা পরিবর্তন হয়েছে৷ কোমল হয়েছে! সে এতো পাল্টে গেল কী করে? প্রেমা বললো,'কেন এমন হয়?'

তুষার শূন্যে চোখ রেখে বললো,'ভালোবেসে মানুষ পাগল হয়,ভালো হয়,খারাপ হয়, নিঃস্ব হয় এমনকি নিজের জীবনকেও হত্যা করতে দুইবার ভাবে না! কী অদ্ভুত!'

তুষারের কথাগুলো প্রেমার ভালো লাগছে। সে তুষারের দিকে ফিরলো। তুষারও প্রেমার দিকে

তাকালো। প্রেমা বললো,'যে ফাঁসে সে জানে,ভালোবাসা বড়ই অদ্ভুত!'

কী সুন্দর কথা! কত মোহনীয় তার কণ্ঠ! তুষার ধীর স্বরে বললো,' কাউকে ভালোবেসেছো?'

প্রশ্নটি শুনে প্রেমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে। সে দ্রুত অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজলো। কী করে সে বুঝাবে, তুষারের প্রেমে পড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়! তার ব্যথিত হৃদয় তারই অজান্তে তুষারের প্রেমে কবেই পড়েছে! তুষার প্রেমার পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার কেন যেন মনে হলো,প্রেমা তার চোখের দৃষ্টি আড়াল করেছে!

লিখনের মা ফাতিমা ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করছেন। তিনি তৃধার সাথে লিখনের বিয়ে ঠিক করেছেন। কিন্তু লিখন বিয়ে করবে না। সে

পদ্মজার জন্য অপেক্ষা করছে। পদ্মজা জেল থেকে বের হলে তাকেই বিয়ে করবে। ফাতিমা একজন খুনি,বিবাহিত,এক বাচ্চার মাকে কিছুতেই ছেলের বউ হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। লিখন যেরকম নাছোড়বান্দা তার মা তেমন নাছোড়বান্দা। ফাতিমা কঠোরভাবে জানিয়েছেন,যদি লিখন পদ্মজাকে বিয়ে করে তিনি আত্মহত্যা করবেন। সম্মান নষ্ট হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়! এতেও লিখন ভ্রুক্ষেপ করলো না। সে পাগল হয়ে আছে। আমির নেই। এবার সে পদ্মজাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে। জীবন তাকে একটা সুযোগ দিয়েছে। সে সেই সুযোগ এড়াতে পারবে না। এতদিন দূরে থেকেছে পদ্মজার স্বামী ছিল বলে। এখন পদ্মজা একা। তার স্বামী মৃত। পদ্মজাকে বিয়ে করে তাকে একটা নতুন জীবন উপহার দিবে,সেই সাথে নিজের ক্ষত হৃদয় সাড়িয়ে তুলবে। লিখন বৈঠকখানাতে

গিয়ে বসলো। যেদিন জানলো পদ্মজা জেলে। সেদিন থেকে সে দৌড়ের উপর আছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। একদিকে পদ্মজার ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা অন্যদিকে মিথ্যা বদনামে তার ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার পথে! ভাগ্য সহায় ছিল,তাই দুটোর কোনোটিরই ক্ষতি হয়নি। এজন্য খোদার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া! দ্বিতীয় তলা থেকে ফাতিমার চিৎকার ভেসে আসে,'এই মেয়ের জন্য আমার ছেলে জীবনে প্রথমবার আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল। এমন অশুভ মেয়েকে আমি আমার ছেলের জীবনে মেনে নেব না। তুমি তোমার ছেলেকে সামলাও।'
ফাতিমাকে তার স্বামী সামলানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না।
দরজায় কলিং বেল বেজে উঠে। আশেপাশে কেউ নেই। লিখন কয়েকবার তাদের বাসার

কাজের মেয়েটিকে ডাকলো। তারও খোঁজ নেই। লিখন বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলতে গেল। দরজার সামনে তার বাড়ির দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা খাম। লিখন প্রশ্ন করলো,'কে দিয়েছে?'
দারোয়ান বললো,'তুষার সাহেব পাঠিয়েছেন।'
লিখন খামটি হাতে নিয়ে বললো,'আচ্ছা,যাও।'
লিখন দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে আসে। খামটি বিছানায় উপর রেখে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে দেখার সময় সে তার পাশে পদ্মজাকেও দেখতে পায়। তার জীবনে কিছুর অভাব নেই। শুধু একটাই অভাব, পদ্মজার অভাব! সে তার পরনের শার্ট খুলে গোসলখানায় গেল। গোসল করে কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে তারপর খামটি হাতে নিল। খামের ভেতর চিঠি! লিখন আগ্রহ নিয়ে চিঠির ভাঁজ খুললো:-

সম্মানিত লিখন শাহ,
আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। সর্বপ্রথম বলতে চাই,আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি আপনাকে এবং আপনার অনুভূতিকে সম্মান করি। বাধ্য হয়ে কারাগারে থাকা অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে হলো। শুনেছি,আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আপনি আমাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু কিছু স্বপ্ন নিষিদ্ধ! আপনি এমন এক আশায় নিষ্পাপ একটি মনকে আঘাত করছেন যে আশা পূরণ হওয়ার নয়। আপনার সাথে আমার বিয়ে হলে আগেই হতো। আমার মনপ্রাণ একজনের প্রেমে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই কী করে আবার আপনি পুড়াবেন? মানুষ এক জীবনে সবকিছু পায় না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু না কিছুর অভাব থাকে। এক-দুটো অভাব নিয়ে

বেঁচে থাকা খুব বেশি কঠিন নয়৷ যে আপনাকে ভালোবাসে তাকে আপনি ভালোবাসুন। যে আপনার জন্য মরতে প্রস্তুত তার জন্য বুকের এক টুকরো জায়গা দলিল করে দিন। তৃধা মেয়েটি ভীষণ ভালো। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে আপনাকে খুব ভালোবাসে। তার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার। অথচ,সে মেডিকেলের পড়া ছেড়ে মিডিয়ায় যোগ দিয়েছে! কতোটা ভালোবাসা থাকলে মানুষ এরকম করে? আপনি নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য তৃধা আপনাকে ভালোবাসে! সে আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। তৃধাই আপনাকে উজাড় করে ভালোবাসতে পারবে। আমাদের জুটি হওয়া সম্ভব নয়৷ এ স্বপ্নকে আর দূরে যেতে দিয়েন না। আমার সর্বত্র জুড়ে একটি নাম। আমি একটি মানুষের জন্যই আকুল। আমি হাজার চেষ্টা করেও আপনাকে এক টুকরো ভালোবাসা দিতে

পারবো না। তখন ভালোবাসা অভিশাপে পরিণত হবে। চিন্তা করে দেখুন, আমাদের সত্যি বিয়ে হলে কেউ সুখী হবে না। না আপনি হবেন, না আমি হবো। আর না আপনার পরিবার আর তৃধা সুখী হবে৷ আমি বলছি না আমার কথায় তৃধাকে বিয়ে করতে,ভালোবাসতে। ভালোবাসা জোর করে হয় না৷ তবে বিয়েতে আল্লাহ তায়ালা নিজে রহমত ঢেলে দেন। ভালোবাসা ঢেলে দেন। জীবনকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন৷ আমার আম্মা বলতেন,পৃথিবীতে মানুষ দায়িত্ব নিয়ে আসে৷ সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হয়তো আমার কোনো দায়িত্ব বাকি! তাই এখনো বেঁচে আছি। যদি সত্যি দশ বছর পর পৃথিবীর বুকে মুক্ত হয়ে হাঁটার সুযোগ পাই,আমি আপনাকে আমার পাশে দেখতে চাই না। আমি আমার স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। এই

বাঁচায় সুখ না থাকুক, স্বস্তি আছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেই স্বস্তিটুকু কেড়ে নিবেন না। আপনি আমার জীবনের গল্পটির একটা পৃষ্ঠা মাত্র! আমি আমার শেষ জীবনটুকু নিজের মতো কাটাতে চাই। পাষাণের মতো কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত! আপনার জীবন ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠুক। পরিবারকে সময় দিন।

ইতি,
পদ্মজা

লিখনের চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল চিঠির উপর পড়ে! কী নিষ্ঠুর প্রতিটি শব্দ! লিখন চিঠিটি রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। ধূলো উড়িয়ে বাতাস ছুটছে। আজ রাতে ঝড় হতে পারে! তার বুকেও ঝড় বইছে। নিজেকে পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট

মনে হচ্ছে! পদ্মজা তার জন্য চাঁদই রয়ে গেল
আর সে গরীব ব্রাহ্মণ!